سورة النازعات

সূরা নাযিয়াত

মক্কায় অবতীর্ণ, ৪৬ আয়াত, ২ রুকু'

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ﴿١﴾ وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ﴿٢﴾ وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ﴿٣﴾ فَالسّٰبِقٰتِ
سَبْقًا ﴿٤﴾ فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ﴿٥﴾ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ﴿٦﴾ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ﴿٧﴾
قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ﴿٨﴾ اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ﴿٩﴾ يَقُوْلُوْنَ ءَاِنَّا لَمَرْدُ
وْدُوْنَ فِي الْحَافِرَةِ ﴿١٠﴾ ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ﴿١١﴾ قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴿١٢﴾
فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ﴿١٣﴾ فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴿١٤﴾ هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى
﴿١٥﴾ اِذْ نَادٰىهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٦﴾ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ﴿١٧﴾
فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰى اَنْ تَزَكّٰى ﴿١٨﴾ وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى ﴿١٩﴾ فَاَرٰىهُ الْاٰيَةَ
الْكُبْرٰى ﴿٢٠﴾ فَكَذَّبَ وَعَصٰى ﴿٢١﴾ ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى ﴿٢٢﴾ فَحَشَرَ فَنَادٰى ﴿٢٣﴾ فَقَالَ اَنَا
رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى ﴿٢٤﴾ فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى ﴿٢٥﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً
لِّمَنْ يَّخْشٰى ﴿٢٦﴾ ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ بَنٰىهَا ﴿٢٧﴾ رَفَعَ سَمْكَهَا
فَسَوّٰىهَا ﴿٢٨﴾ وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰىهَا ﴿٢٩﴾ وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰىهَا ﴿٣٠﴾ اَخْرَجَ
مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعٰىهَا ﴿٣١﴾ وَالْجِبَالَ اَرْسٰىهَا ﴿٣٢﴾ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ﴿٣٣﴾ فَاِذَا
جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى ﴿٣٥﴾ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ
لِمَنْ يَّرٰى ﴿٣٦﴾ فَاَمَّا مَنْ طَغٰى ﴿٣٧﴾ وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾ فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاْوٰى ﴿٣٩﴾

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٤١﴾
يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ﴿٤٢﴾ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا ﴿٤٣﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ
مُنتَهَاهَا ﴿٤٤﴾ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا ﴿٤٥﴾ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا
إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ﴿٤٦﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) শপথ সেই ফেরেশতাগণের, যারা ডুব দিয়ে আত্মা উৎপাটন করে, (২) শপথ তাদের, যারা আত্মার বাধন খুলে দেয় মৃদুভাবে ; (৩) শপথ তাদের, যারা সন্তরণ করে দ্রুতগতিতে, (৪) শপথ তাদের, যারা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয় এবং (৫) শপথ তাদের, যারা সকল কর্ম নির্বাহ করে—কিয়ামত অবশ্যই হবে। (৬) যেদিন প্রকম্পিত করবে প্রকম্পিতকারী, (৭) অতঃপর পশ্চাতে আসবে পশ্চাৎগামী ; (৮) সেদিন অনেক হৃদয় ভীত-বিহ্বল হবে। (৯) তাদের দৃষ্টি নত হবে। (১০) তারা বলে ঃ আমরা কি উলটো পায়ে প্রত্যাবর্তিত হবই—(১১) গলিত অস্থি হয়ে যাওয়ার পরও ? (১২) তবে তো এ প্রত্যাবর্তন সর্বনাশা হবে ! (১৩) অতএব এটা তো কেবল এক মহা-নাদ, (১৪) তখনই তারা ময়দানে আবির্ভূত হবে। (১৫) মূসার বৃত্তান্ত আপনার কাছে পৌঁছেছে কি ? (১৬) যখন তাঁর পালনকর্তা তাঁকে পবিত্র তুয়া উপত্যকায় আহ্বান করেছিলেন, (১৭) ফিরাউনের কাছে যাও, নিশ্চয় সে সীমালংঘন করেছে। (১৮) অতঃপর বল ঃ তোমার পবিত্র হওয়ার আগ্রহ আছে কি ? (১৯) আমি তোমাকে তোমার পালনকর্তার দিকে পথ দেখাব, যাতে তুমি তাঁকে ভয় কর। (২০) অতঃপর সে তাকে মহা-নিদর্শন দেখাল। (২১) কিন্তু সে মিথ্যারোপ করল এবং অমান্য করল। (২২) অতঃপর সে প্রতিকার চেষ্টায় প্রস্থান করল। (২৩) সে সকলকে সমবেত করল এবং সজোরে আহ্বান করল (২৪) এবং বলল ঃ আমিই তোমাদের সেরা পালনকর্তা। (২৫) অতঃপর আল্লাহ্ তাকে পরকালের ও ইহকালের শাস্তি দিলেন। (২৬) যে ভয় করে তার জন্য অবশ্যই এতে শিক্ষা রয়েছে। (২৭) তোমাদের সৃষ্টি অধিক কঠিন না আকাশের, যা তিনি নির্মাণ করেছেন ? (২৮) তিনি একে উচ্চ করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন। (২৯) তিনি এর রাত্রিকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং এর সূর্যালোক প্রকাশ করেছেন। (৩০) পৃথিবীকে এর পরে বিস্তৃত করেছেন। (৩১) তিনি এর মধ্য থেকে এর পানি ও ঘাম নির্গত করেছেন (৩২) পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, (৩৩) তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদের উপকারার্থে। (৩৪) অতঃপর যখন মহাসংকট এসে যাবে (৩৫) অর্থাৎ যেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম স্মরণ করবে (৩৬) এবং দর্শকদের জন্য জাহান্নাম প্রকাশ করা হবে, (৩৭) তখন যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছে (৩৮) এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, (৩৯) তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। (৪০) পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান

হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশী থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, (৪১) তার ঠিকানা হবে জান্নাত। (৪২) তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, কিয়ামত কখন হবে? (৪৩) এর বর্ণনার সাথে আপনার কি সম্পর্ক? (৪৪) এর চরম জ্ঞান আপনার পালনকর্তার কাছে। (৪৫) যে একে ভয় করে, আপনি তো কেবল তাকেই সতর্ক করবেন। (৪৬) যেদিন তারা একে দেখবে, সেদিন মনে হবে যেন তারা দুনিয়াতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক সকাল অবস্থান করেছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

শপথ সেই ফেরেশতাগণের যারা (কাফিরদের) প্রাণ নির্মমভাবে বের করে। শপথ তাদের, যারা (মুসলমানদের আত্মা মৃদুভাবে বের করে যেন) বাঁধন খুলে দেয়। শপথ তাদের, যারা (আত্মাকে নিয়ে পৃথিবী থেকে আকাশের দিকে দ্রুতগতিতে ধাবমান হয় যেন) সন্তরণ করে। অতঃপর (যখন আত্মাকে নিয়ে পৌঁছে, তখন আত্মা সম্পর্কে আল্লাহ্‌র আদেশ পালনার্থে) দ্রুত অগ্রসর হয়, অতঃপর (এই আত্মা সম্পর্কে সওয়াবের আদেশ হোক অথবা আযাবের, উভয়) কার্য নির্বাহ করে। (এসব শপথ করে বলেন যে) কিয়ামত অবশ্যই হবে, যেদিন প্রকম্পিত করবে প্রকম্পিতকারী (অর্থাৎ শিংগার প্রথম ফুঁক)। অতঃপর পশ্চাতে আসবে পশ্চাৎগামী (অর্থাৎ শিংগার দ্বিতীয় ফুঁক)। অনেক হৃদয় সেদিন ভীত-বিহবল হবে, তাদের দৃষ্টি (অনুতাপের ভারে) নত হবে। (কিন্তু তারা এখন কিয়ামত অস্বীকার করে এবং) বলে ঃ আমরা কি পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হব? (অর্থাৎ মৃত্যুর পর আবার পুনরুজ্জীবন হবে কি? উদ্দেশ্য, এটা কিরূপে হতে পারে?) গলিত অস্থি হয়ে যাওয়ার পরও কি? (উদ্দেশ্য, এটা খুবই কঠিন। যদি এরূপ হয়) তবে তো এ প্রত্যাবর্তন (আমাদের জন্য) সর্বনাশা হবে। (কারণ, আমরা তো এর জন্য কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করিনি। উদ্দেশ্য মুসলমানদের বিশ্বাসের প্রতি বিদ্রূপ করা যে, তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী আমাদের বিরাট ক্ষতি হবে। উদাহরণত একজন অন্যজনকে শুভেচ্ছার বশবর্তী হয়ে সতর্ক করে বলে ঃ এ পথে যেয়ো না, সিংহ আছে। অতঃপর সেই ব্যক্তি অস্বীকারের ছলে কাউকে বলে ঃ ভাই, সে দিকে যেয়ো না, সিংহ খেয়ে ফেলবে। উদ্দেশ্য এই যে, সেখানে সিংহ বলতে কিছুই নেই। অতঃপর খণ্ডন করা হয়েছে যে, তারা কিয়ামতকে অসম্ভব ও কঠিন মনে করে) অতএব, (তারা বুঝে নিক যে, আমার পক্ষে এটা মোটেই কঠিন নয়; বরং) এটা তো কেবল এক মহানাদ হবে, যার ফলে তারা তৎক্ষণাৎ ময়দানে আবির্ভূত হবে। [অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য মূসা (আ) ও ফিরাউনের কাহিনী বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ] আপনার কাছে মূসা (আ)-র বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি? যখন তাঁর পালনকর্তা তাঁকে পবিত্র তুয়া উপত্যকায় আহ্বান করেন যে, তুমি ফিরাউনের কাছে যাও। নিশ্চয় সে সীমালংঘন করেছে। তার কাছে যেয়ে বল ঃ তোমার পবিত্র হওয়ার আগ্রহ আছে কি? (তোমার সংশোধনের নিমিত্ত) আমি তোমাকে তোমার পালনকর্তার (সত্তা ও গুণাবলীর) দিকে পথ দেখাব, যাতে (তাঁর সত্তা ও গুণাবলী শুনে) তুমি তাঁকে ভয় কর। [এই ভয়ের ফলশ্রুতিতে তোমার সংশোধন হয়ে যাবে। এই আদেশ শুনে মূসা (আ) তার কাছে গেলেন এবং পয়গাম পৌঁছালেন] অতঃপর (সে যখন নবুয়তের নিদর্শন

চাইল, তখন) তিনি তাকে মহানিদর্শন (নবুয়তের) দেখালেন (অর্থাৎ লাঠি অথবা লাঠিও সুশুভ্র হাত)। কিন্তু সে (অর্থাৎ ফিরাউন) মিথ্যারোপ করল ও অমান্য করল। অতঃপর [মূসা (আ)-র কাছ থেকে] প্রস্থান করল এবং (তাঁর বিরুদ্ধে) চেষ্টা করল। সে (সকলকে) সমবেত করল এবং (তাদের সামনে) সজোরে ঘোষণা করল ও বলল ঃ আমিই তোমাদের সেরা পালনকর্তা। ('সেরা' কথাটি এমনিতেই প্রশংসার্থে যোগ করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত করা উদ্দেশ্য নয় যে, অন্য আরও পালনকর্তা আছে)। অতঃপর আল্লাহ্ তাকে পরকালের ও ইহকালের শাস্তি দিলেন (ইহকালের শাস্তি নিমজ্জিত করা এবং পরকালের শাস্তি জাহান্নামে প্রজ্বলিত করা)। নিশ্চয় এতে যারা আল্লাহ্কে ভয় করে, তাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। (অতঃপর কিয়ামতকে অসম্ভব ও কঠিন মনে করার যুক্তিগত জওয়াব দেওয়া হয়েছে)। তোমাদের (পুনর্বার) সৃষ্টি অধিক কঠিন, না আকাশের? (এটা অন্যের দিক দিয়ে বলা হয়েছে। নতুবা আল্লাহ্র পক্ষে সব সৃষ্টিই সমান। বলা বাহুল্য, আকাশের সৃষ্টিই অধিক কঠিন। এই কঠিনতর সৃষ্টিই যখন তিনি সম্পন্ন করেছেন, তখন তোমাদের সৃষ্টি আর কি কঠিন হবে। অতঃপর আকাশ সৃষ্টির অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে)। আল্লাহ্ একে নির্মাণ করেছেন, এর ছাদ উচ্চ করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন, (যাতে এর মধ্যে ফাটল, ছিদ্র ও জোড়া তালি না থাকে)। তিনি এর রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন এবং এর সূর্যালোক প্রকাশ করেছেন। (আকাশের রাত্রি ও আকাশের সূর্যালোক বলার কারণ এই যে, সূর্যের উদয় ও অস্ত দ্বারা দিবারাত্রি হয়। সূর্য আকাশের সাথে সম্পৃক্ত)। এর পরে তিনি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন এবং (বিস্তৃত করে) এর মধ্য থেকে এ পানি ও ঘাস নির্গত করেছেন। তিনি পর্বতকে (এর উপর) প্রতিষ্ঠিত করেছেন—তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদের উপকারার্থে। (আসল প্রমাণ ছিল আকাশ সৃষ্টি কিন্তু পৃথিবী সর্বদা দৃষ্টির সামনে থাকে বলে সম্ভবত এর উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া আকাশের সমান না হলেও মানব সৃষ্টির চেয়ে পৃথিবী সৃষ্টি কঠিনতর। সুতরাং প্রমাণের সারমর্ম এই যে, এমন এমন বস্তু যখন আমি নির্মাণ করেছি, তখন তোমাদের পুনর্বার সৃষ্টি করা আর কঠিন হবে কেন? অতঃপর পুনরুত্থানের পর দান প্রতিদানের বস্তু যখন আমি নির্মাণ করেছি, তখন তোমাদের পুনর্বার সৃষ্টি করা আর কঠিন হবে কেন? ঘটনাবলীর বিবরণ দেওয়া হয়েছ)। অতঃপর যখন মহাসংকট এসে যাবে অর্থাৎ মানুষ যেদিন তার কৃতকর্ম স্মরণ করবে এবং দর্শকদের জন্য জাহান্নাম প্রকাশ করা হবে, তখন যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছে এবং (পরকালে অবিশ্বাসী হয়ে) পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি (দুনিয়াতে থাকাকালে) তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়া ভয় করেছে (ফলে কিয়ামত, পরকাল ও হিসাব-নিকাশে পুরোপুরি বিশ্বাস স্থাপন করেছে) এবং খেয়াল-খুশী থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, (অর্থাৎ বিশুদ্ধ বিশ্বাসসহ সৎ কর্মও সম্পাদন করেছে) তার ঠিকানা হবে জান্নাত। (সৎ কর্ম জান্নাতের পথ। এর উপর জান্নাত নির্ভরশীল নয়। কাফিররা অস্বীকারের ছলে কিয়ামতের সময় জিজ্ঞাসা করত, তাই অতঃপর এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে)। তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে কিয়ামত কখন হবে? এর বর্ণনার সাথে আপনার কি সম্পর্ক? (কেননা, জানা থাকলেই বর্ণনা করা যায়। অথচ আমি এর নির্দিষ্ট সময় কাউকে বলিনি; বরং) এর চরম জ্ঞান শুধু আপনার পালনকর্তার কাছেই রয়েছে। আপনি তো কেবল

(সংক্ষিপ্ত খবরের ভিত্তিতে) এমন ব্যক্তিকে সতর্ক করেন, যে একে ভয় করে (এবং ভয় করে ঈমান আনে। যারা কিয়ামতের ব্যাপারে তড়িঘড়ি করছে, তাদের বুঝে নেওয়া উচিত যে) যেদিন তারা একে দেখবে সেদিন (তাদের) মনে হবে যেন তারা দুনিয়াতে মাত্র একদিনের শেষাংশ অথবা এক দিনের প্রথমাংশ অবস্থান করেছে। (অর্থাৎ দুনিয়ার দীর্ঘজীবন খাটো মনে হবে। তারা মনে করবে আযাব বড় তাড়াতাড়ি এসে গেছে। সার কথা এই যে, তড়িঘড়ি কর কেন? যখন আসবে, তখন মনে করবে যে, দ্রুত এসে গেছে। তোমরা এখন যাকে বিলম্ব মনে করছ, তখন কিন্তু তা বিলম্ব মনে হবে না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا—نازعات-শব্দটি نزع--থেকে উদ্ভূত। অর্থ কোন কিছুকে উৎপাটন করা। اغراق ও غرق –এর অর্থ কোন কাজ নির্মমভাবে করা। বাক-পদ্ধতিতে বলা হয় ঃ اغرق النازع فى القوس— অর্থাৎ তীর নিক্ষেপকারী ধনুকে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করেছে। সূরার শুরুতে ফেরেশতাগণের কতিপয় গুণ ও অবস্থা বর্ণনা করে তাদের শপথ করা হয়েছে। শপথের জওয়াব উহ্য রাখা হয়েছে। অর্থাৎ কিয়ামত ও হাশর-নশর অবশ্যই হবে। ফেরেশতাগণ এখনও সারা বিশ্বের কাজকর্ম ও শৃঙ্খলা বিধানে নিয়োজিত রয়েছে কিন্তু কিয়ামতের দিন যখন বস্তুনিষ্ঠ কারণাদি নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে এবং অসাধারণ পরিস্থিতির উদ্ভব হবে, তখন ফেরেশতাগণই যাবতীয় কর্ম নির্বাহ করবে। এই সম্পর্কের কারণে সূরায় তাদের শপথ করা হয়েছে।

এস্থলে ফেরেশতাগণের পাঁচটি বিশেষণ বর্ণিত হয়েছে। এগুলো মানুষের মৃত্যু ও আত্মা বের করার সাথে সম্পর্কযুক্ত। উদ্দেশ্য, কিয়ামতের সত্যতা বর্ণনা করা। মানুষের মৃত্যু দ্বারা এই বর্ণনা শুরু করা হয়েছে। কেননা, প্রত্যেক মানুষের মৃত্যু তার জন্য আংশিক কিয়ামত হয়ে থাকে। কিয়ামতের বিশ্বাসে এর প্রভাব অসাধারণ। প্রথম বিশেষণ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ---অর্থাৎ নির্মমভাবে টেনে আত্মা নির্গতকারী। এখানে আযাবের সে সব ফেরেশতা বোঝানো হয়েছে, যারা কাফিরের আত্মা নির্মমভাবে বের করে। যেহেতু এই নির্মমতা আত্মিক হয়ে থাকে, তাই দর্শকদেরও এটা অনুভব করা জরুরী নয়। এ কারণেই কাফিরদের আত্মা প্রায়ই সহজে বের হতে দেখা যায় কিন্তু এটা কেবল আমাদের দেখার মধ্যেই। তার আত্মার উপর যে নির্মম কাণ্ড সংঘটিত হয়, তা কে দেখতে পারে। এটা তো আল্লাহ্‌র উক্তি থেকেই জানা যায়। তাই আলোচ্য আয়াতে খবর দেওয়া হয়েছে যে, কাফিরদের আত্মা টেনে টেনে নির্মমভাবে বের করা হয়।

দ্বিতীয় বিশেষণ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا—ناشطات -শব্দটি نشط থেকে উদ্ভূত। অর্থ বাঁধন খুলে দেওয়া। কোন কিছুতে পানি অথবা বাতাস ভর্তি থাকলে যদি তার বাঁধন খুলে দেওয়া

হয়, তবে সেই পানি বা বাতাস সহজে বের হয়ে যায়। এতে মু'মিনের আত্মা বের করাকে এর সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে যে, যে ফেরেশতা মু'মিনের রূহ কবজ করার কাজে নিয়োজিত আছে, সে অনায়াসে রূহ কবজ করে---কঠোরতা করে না। এখানেও বিষয়টি আত্মিক বিধায় কোন মুসলমান বরং সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তির মৃত্যুর সময় আত্মা বের হতে বিলম্ব হলে একথা বলা যায় না যে, তার প্রতি নির্মমতা করা হচ্ছে---যদিও শারীরিকভাবে নির্মমতা পরিদৃষ্ট হয়। প্রকৃত কারণ এই যে, কাফিরের আত্মা বের করার সময় থেকেই বরযখের আযাব সামনে এসে যায়। এতে তার আত্মা অস্থির হয়ে দেহে আত্মগোপন করতে চায়। ফেরেশতা জোরে-জবরে টানা-হেঁচড়া করে তাকে বের করে। পক্ষান্তরে মু'মিনের রূহের সামনে বরযখের সওয়াব নিয়ামত ও সুসংবাদ ভেসে উঠে। ফলে সে দ্রুতবেগে সে দিকে যেতে চায়।

তৃতীয় বিশেষণ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا---سبح-এর আভিধানিক অর্থ সন্তরণ করা। এখানে উদ্দেশ্য দ্রুতবেগে চলা। নদীপথে কোন বাধা-বিঘ্ন থাকে না। সন্তরণকারী ব্যক্তি অথবা নৌকারোহী সোজা গন্তব্য স্থানের দিকে ধাবিত হয়। এই সন্তরণকারী বিশেষণ-টিও মৃত্যুর ফেরেশতাগণের সাথে সম্পর্কযুক্ত। মানুষের রূহ্ কবজ করার পর তারা দ্রুত গতিতে আকাশের দিকে নিয়ে যায়।

চতুর্থ বিশেষণ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا---উদ্দেশ্য এই যে, যে আত্মা ফেরেশতাগণের হস্তগত হয়, তাকে ভাল অথবা মন্দ ঠিকানায় পৌঁছানোর কাজে তারা দ্রুততায় একে অপরকে ডিঙ্গিয়ে যায়। তারা মু'মিনের আত্মাকে জান্নাতের আবহাওয়ায় ও নিয়ামতের জায়গায় এবং কাফিরের আত্মাকে জাহান্নামের আবহাওয়ায় ও আযাবের জায়গায় পৌঁছিয়ে দেয়।

পঞ্চম বিশেষণ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا---মৃত্যুর ফেরেশতাদের সর্বশেষ কাজ এই যে, যে আত্মাকে সওয়াব ও আরাম দেওয়ার আদেশ হয়, তারা তার জন্য সওয়াব ও আরামের ব্যবস্থা করে এবং যাকে আযাব ও কষ্টে রাখার আদেশ হয়, তারা তার জন্য আযাব ও কষ্টের ব্যবস্থা করে।

কবরে সওয়াব ও আযাব ঃ উল্লিখিত আয়াতসমূহ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ফেরে-শতাগণ মানুষের মৃত্যুর সময় আগমন করে রূহ্ কবজ করে আকাশের দিকে নিয়ে যায়, ভাল অথবা মন্দ ঠিকানায় দ্রুতবেগে পৌঁছিয়ে দেয় ও সেখানে সওয়াব অথবা আযাব এবং কষ্ট অথবা সুখের ব্যবস্থা করে। এই আযাব ও সওয়াব কবরে অর্থাৎ বরযখে হবে। হাশরের আযাব ও সওয়াব এর পরে হবে। সহীহ্ হাদীসসমূহে এর বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। মসনদে আহমদের বরাত দিয়ে মেশকাতে এতদসম্পর্কিত হযরত বারা ইবনে আযেব (রা)-এর একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত আছে।

নফ্স ও রূহ্ সম্পর্কে কাযী সানাউল্লাহ্ (র)-র উপাদেয় বক্তব্য ঃ তফসীরে মাযহারীর বরাত দিয়ে নফ্স ও রূহের স্বরূপ সম্পর্কে কিছু আলোচনা সূরা হিজরের আয়াতে

উল্লেখ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য কাযী সানাউল্লাহ্ পানিপথী (র) এ স্থলে লিপিবদ্ধ করেছেন। এসব তথ্যের মধ্যে অনেক প্রশ্নের সমাধান পাওয়া যায়। নিম্নে তা উদ্ধৃত করা হল।

হযরত বারা ইবনে আযেব (রা)-এর হাদীস থেকে জানা যায় যে, মানুষের নফ্স উপাদান চতুষ্টয় দ্বারা গঠিত একটি সূক্ষ্ম দেহ, যা তার জড় দেহে নিহিত আছে। দার্শনিক ও চিকিৎসাবিদগণ একেই রূহ্ বলে থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষের রূহ্ একটি অশরীরী আল্লাহ্‌র নৈপুণ্য, যা নফসের সাথে বিশেষ সম্পর্ক রাখে এবং নফসের জীবন এর উপরই নির্ভরশীল। ফলে এটা যেন রূহের রূহ্। কারণ, দেহের জীবন নফ্সের উপর এবং নফ্সের জীবন এর উপর নির্ভরশীল। নফ্সের সাথে এই রূহের যে সম্পর্ক, তার স্বরূপ স্রষ্টা ব্যতীত কেউ জানে না। নফ্সকে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কুদরত দ্বারা এমন একটি আয়না সদৃশ করেছেন, যাকে সূর্যের বিপরীতে রেখে দেওয়া হয়েছে। সূর্যের আলো তাতে প্রতিফলিত হওয়ার ফলে সে নিজেও সূর্যের ন্যায় আলো বিকিরণ করে। মানুষের নফ্স যদি ওহীর শিক্ষা অনুযায়ী সাধনা ও পরিশ্রম করে তবে সে নিজেও আলোকিত হয়ে যায়। নতুবা সে জড় দেহের বিরূপ প্রভাব দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে। এই সূক্ষ্ম দেহ তথা নফসকেই ফেরেশতাগণ উপরে নিয়ে যায়। অতঃপর সম্মান সহকারে নিচে আনে যদি সে আলোকিত হয়ে থাকে। নতুবা তার জন্য আকাশের দ্বার খুলে না এবং উপর থেকেই নিচে সজোরে নিক্ষেপ করা হয়। এই সূক্ষ্ম দেহ সম্পর্কেই উপরোক্ত হাদীসে আছে যে, আমি একে পৃথিবীর মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি, এতেই ফিরিয়ে আনব এবং পুনরায় এই মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করব। এই সূক্ষ্ম দেহই সৎ কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে আলোকিত ও সুগন্ধযুক্ত হয়ে যায় এবং কুফর ও শিরকের মাধ্যমে দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যায়। জড় দেহের সাথে অশরীরী রূহের সম্পর্ক সূক্ষ্ম দেহ অর্থাৎ নফ্সের মাধ্যমে স্থাপিত হয়। অশরীরী রূহ্ মৃত্যুর আওতায় পড়ে না। কবরের আযাব এবং সওয়াবও নফ্সের সাথে জড়িত থাকে। কবরের সাথে এ নফ্সেরই সম্পর্ক থাকে এবং অশরীরী রূহ্ ইল্লিয়্যীনে অবস্থান করে পরোক্ষভাবে নফ্সের সওয়াব এবং আযাব দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। এভাবে রূহ্ কবরে থাকে কথাটি নফ্স কবরে থাকে অর্থে বিশুদ্ধ এবং নফ্স রূহ্ জগতের অথবা ইল্লিয়্যীনে থাকে কথাটি রূহ্ থাকে অর্থে নির্ভুল। এর ফলে বিভিন্ন রেওয়ায়েতের অসামঞ্জস্য দূর হয়ে যায়। অতঃপর কিয়ামতের বাস্তবতা, এতে প্রথম ফুঁৎকার দ্বারা সমগ্র বিশ্বের ধ্বংসপ্রাপ্তি, দ্বিতীয় ফুঁৎকার দ্বারা সমগ্র বিশ্বের পুনঃ সৃষ্টি এবং এ সম্পর্কে কাফিরদের আপত্তি ও তার জওয়াব উল্লেখ করা হয়েছে। অবশেষে বলা হয়েছে : فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ — ساهرة অর্থ সমতল ময়দান। কিয়ামতে পুনরায় যে ভূপৃষ্ঠ সৃষ্টি করা হবে, তা সমতল হবে, এতে উঁচু-নিচু, পাহাড়-পর্বত, টিলা ইত্যাদি কিছুই থাকবে না। একেই ساهرة বলা হয়েছে। অতঃপর কিয়ামত অবিশ্বাসীদের হঠকারিতা ও শত্রুতার ফলে রসূলুল্লাহ্ (সা) যে মর্মপীড়া অনুভব করতেন, তা দূর করার উদ্দেশ্যে হযরত মূসা (আ) ও ফিরাউনের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে এবং ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শত্রুরা কেবল আপনাকেই কষ্ট দেয়নি, পূর্ববর্তী

পয়গম্বরগণও শত্রুদের পক্ষ থেকে দারুণ মর্মপীড়া অনুভব করেছেন। তাঁরা সবর করেছেন। অতএব, আপনারও সবর করা উচিত।

فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى — نَكَال -শব্দের অর্থ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, যা দেখে অন্যরাও আতঙ্কিত হয়ে যায়। نَكَالَ الْاٰخِرَةِ হল ফিরাউনের পরকালীন আযাব এবং نَكَالَ الْاُوْلٰى -দরিয়ায় নিমজ্জিত হওয়ার আযাব। অতঃপর মরে মাটিতে পরিণত হয়ে যাওয়ার পর পুনরুজ্জীবন কিরূপে হবে! কাফিরদের এই বিস্ময়ের জওয়াব দেওয়া হয়েছে। এতে নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সৃজিত বস্তুসমূহের উল্লেখ করে অনবধান মানুষকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, যে মহান সত্তা কোনরূপ উপকরণ ও হাতিয়ার ব্যতিরেকেই এসব মহাসৃষ্টিকে প্রথমবার অস্তিত্ব দান করেছেন, তিনি যদি এগুলোর ধ্বংসপ্রাপ্তির পর পুনরায় সৃষ্টি করে দেন, তবে এতে বিস্ময়ের কি আছে? এরপর আবার কিয়ামত দিবসের কঠোরতা, প্রত্যেকের আমলনামা সামনে আসা এবং জান্নাতী ও জাহান্নামীদের ঠিকানা বর্ণনা করা হয়েছে। অবশেষে জাহান্নামী ও জান্নাতীদের বিশেষ বিশেষ আলামত উল্লিখিত হয়েছে, যদ্দ্বারা একজন মানুষ দুনিয়াতেই ফয়সালা করতে পারে যে, 'আইনের দৃষ্টিতে' তার ঠিকানা জান্নাত, না জাহান্নাম। আইনের দৃষ্টিতে বলার কারণ এই যে, অনেক আয়াত ও হাদীস থেকে জানা যায় যে, কারও সুপারিশে অথবা সরাসরি আল্লাহ্‌র রহমতে কোন কোন জাহান্নামীকে জান্নাতে পৌঁছানো হবে। কারও বেলায় এরূপ হলে সেটা হবে ব্যতিক্রমধর্মী আদেশ। জান্নাতে অথবা জাহান্নামে যাওয়ার আসল বিধি তাই, যা এসব আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

فَاَمَّا مَنْ طَغٰى প্রথমে জাহান্নামীদের দুটি বিশেষ আলামত বর্ণিত হয়েছে।

وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ——এক. আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূলের অবাধ্যতা করা। দুই. পার্থিব জীবনকে পরকালের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া অর্থাৎ যে কাজ অবলম্বন করলে দুনিয়াতে সুখ ও আনন্দ পাওয়া যায় কিন্তু পরকালে তার জন্য আযাব নির্দিষ্ট আছে, সে ক্ষেত্রে পরকালের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে দুনিয়ার সুখ ও আনন্দকেই অগ্রাধিকার দেওয়া। দুনিয়াতে যে ব্যক্তির মধ্যে এই দুটি আলামত পাওয়া যায়, তার সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاْوٰى —অর্থাৎ জাহান্নামই তার ঠিকানা। এরপর জান্নাতীদেরও দুটি বিশেষ আলামত বর্ণনা করা হয়েছে ঃ وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى

النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى—এক. দুনিয়াতে প্রত্যেক কাজের সময় এরূপ ভয় করা যে, একদিন আল্লাহ্ তা'আলার সামনে উপস্থিত হয়ে এ কাজের হিসাব দিতে হবে। দুই. অবৈধ খেয়াল-খুশী চরিতার্থ করা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখা। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে এই দুটি গুণ অর্জন করতে সক্ষম হয়, কোরআন পাক তাকে সুসংবাদ দেয়ঃ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى— অর্থাৎ জান্নাতই তার ঠিকানা।

খেয়াল-খুশীর বিরোধিতার তিন স্তরঃ আলোচ্য আয়াতে জান্নাত ঠিকানা হওয়ার দুটি শর্ত ব্যক্ত করা হয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, ফলাফলের দিক দিয়ে এগুলো একই শর্ত। কারণ, প্রথম শর্ত হচ্ছে আল্লাহ্র সামনে জবাবদিহির ভয় এবং দ্বিতীয় শর্ত নিজেকে খেয়াল-খুশী থেকে বিরত রাখা। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র ভয়ই মানুষকে খেয়াল-খুশীর অনুসরণ থেকে বিরত রাখে। কাযী সানাউল্লাহ্ পানিপথী (র) তফসীরে মাযহারীতে খেয়াল-খুশীর বিরোধিতার তিনটি স্তর উল্লেখ করেছেন।

প্রথম স্তর এই যে, যেসব ভ্রান্ত আকীদা ও বিশ্বাস কোরআন, হাদীস এবং ইজমার বিপরীত, সেগুলো থেকে আত্মরক্ষা করা। কেউ এই স্তরে পৌঁছলেই সে সুন্নী মুসলমান কথিত হওয়ার যোগ্য হয়।

মধ্যম স্তর এই যে, কোন গোনাহ্ করার সময় আল্লাহ্র সামনে জবাবদিহির কথা চিন্তা করে গোনাহ্ থেকে বিরত থাকা। সন্দেহজনক কাজ থেকেও বিরত থাকা এবং কোন জায়েয কাজে লিপ্ত হওয়ার ফলে কোন নাজায়েয কাজে লিপ্ত হওয়ার আশংকা দেখা দিলে সেই জায়েয কাজ থেকে বিরত থাকাও এই মধ্যম স্তরের পরিশিষ্ট। হযরত নোমান ইবনে বশীর (রা)-এর হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ যে ব্যক্তি সন্দেহজনক কাজ থেকে বিরত থাকে, সে তার আবরু ও ধর্মকে রক্ষা করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সন্দেহজনক কাজে লিপ্ত হয়, সে পরিশেষে হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে যাবে। যে কাজে জায়েয ও নাজায়েয উভয়বিধ সম্ভাবনা থাকে তাকেই সন্দেহজনক কাজ বলা হয়। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মনে সন্দেহ দেখা দেয় যে, কাজটি তার জন্য জায়েয না নাজায়েয। উদাহরণত জনৈক রুগ্ন ব্যক্তি অযু করতে সক্ষম কিন্তু অযু করা তার জন্য ক্ষতিকরই হবে এ বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাস নেই। এমতাবস্থায় তায়াম্মুম করা জায়েয কিনা, তা সন্দেহযুক্ত হয়ে গেল। এমনিভাবে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পারে কিন্তু খুব বেশী কষ্ট হয়। এমতাবস্থায় বসে নামায পড়া জায়েয কিনা তা সন্দিগ্ধ হয়ে গেল। এরূপ ক্ষেত্রে সন্দিগ্ধ কাজ পরিত্যাগ করে নিশ্চিত জায়েয কাজ করা তাকওয়া এবং খেয়াল-খুশীর বিরোধিতার মধ্যম স্তর।

নফসের চক্রান্তঃ যেসব বিষয় প্রকাশ্য গোনাহ্, সেসব বিষয়ে খেয়াল-খুশীর বিরোধিতা করার চেষ্টা করলে যে কেউ নিজে নিজেই সাফল্য অর্জন করতে পারে। কিন্তু কিছু কিছু খেয়াল-খুশী এমনও রয়েছে, যেগুলো ইবাদত ও সৎ কর্মে শামিল হয়ে যায়। রিয়া, নাম-যশ, আত্মপ্রীতি এমন সূক্ষ্ম গোনাহ্ ও খেয়াল-খুশী, যাতে মানুষ প্রায়শই ধোঁকা খেয়ে নিজের কর্মকে

সঠিক ও বিশুদ্ধ মনে করতে থাকে। বলা বাহুল্য, এই খেয়াল-খুশীর বিরোধিতা করাই সর্ব-প্রথম ও সর্বাধিক জরুরী। কিন্তু এ থেকে আত্মরক্ষা করার একটি মাত্র অব্যর্থ ও অমোঘ ব্যবস্থাপত্র আছে। তা এই যে, এমন শায়খে-কামেল তালাশ করে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে হবে, যিনি কোন সুদক্ষ শায়খের সংসর্গে থেকে সাধনা করেছেন এবং নফসের দোষত্রুটি ও তার প্রতিকার সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছেন।

শায়খ-ইমাম ইয়াকুব কারখী (র) বলেনঃ আমি প্রথম বয়সে কাঠমিস্ত্রী ছিলাম। আমি নিজের মধ্যে এক প্রকার শৈথিল্য ও অন্ধকার অনুভব করে কয়েকদিন রোযা রাখার ইচ্ছা করলাম, যাতে এই অন্ধকার ও শৈথিল্য দূর হয়ে যায়। ঘটনাক্রমে এই রোযা রাখা অবস্থায় আমি একদিন শায়খে-কামেল ইমাম বাহাউদ্দীন নকশবন্দী (র)-র খিদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি মেহ্মানদের জন্য গৃহ থেকে আহার্য আনালেন এবং আমাকেও খাওয়ার আদেশ দিলেন। অতঃপর বললেনঃ যে ব্যক্তি নিজের খেয়াল-খুশীর বান্দা, সে অত্যন্ত মন্দ বান্দা। এই খেয়াল-খুশী তাকে পথভ্রষ্ট করে ছাড়ে। তিনি আরও বললেনঃ খেয়াল-খুশীর অনুগামী হয়ে যে রোযা রাখা হয়, তার চেয়ে খানা খেয়ে নেওয়াই উত্তম। এসব কথাবার্তা শুনে আমি উপলব্ধি করতে পারলাম যে, আমি আত্মপ্রীতির শিকার হচ্ছিলাম এবং শায়খ তা ধরে ফেলেছেন। তখন আমার বুঝতে বাকী রইল না যে, যিক্‌র-আযকার ও নফল ইবাদতে কোন শায়খে-কামেলের অনুমতি ও নির্দেশ দরকার। কেননা, শায়খে-কামেল নফসের চক্রান্ত জানেন, বুঝেন। যে নফল ইবাদতে নফসের চক্রান্ত থাকবে, তিনি তা করতে নিষেধ করবেন। আমি শায়খের নিকট আরয করলাম, হযরত, পরিভাষায় যাকে ফানাফিল্লাহ্ ও বাকাবিল্লাহ্ বলা হয়, এরূপ শায়খ পাওয়া না গেলে কি করতে হবে? শায়খ বললেনঃ এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাযের পর বিশবার করে দৈনিক একশ বার ইস্তেগফার করা উচিত। কেননা, রসূলে করীম (সা) বলেনঃ আমি মাঝে মাঝে অন্তরে মলিনতা অনুভব করি। তখন আমি প্রত্যহ একশ বার ইস্তেগফার অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

খেয়াল-খুশীর বিরোধিতার তৃতীয় স্তর এই যে, অধিক যিক্‌র, অধ্যবসায় ও সাধনার মাধ্যমে নফসকে এমন পবিত্র করা, যাতে খেয়াল-খুশীর চিহ্নটুকুও অবশিষ্ট না থাকে। এটা বিশেষ ওলীত্বের স্তর এবং তা সেই ব্যক্তিরই হাসিল হয়, যাকে সূফী বুযুর্গগণের পরিভাষায় ফানাফিল্লাহ্ ও বাকাবিল্লাহ্ বলা হয়। এই শ্রেণীর ওলীগণের সম্পর্কেই কোরআনে শয়তানকে সম্বোধন করে বলা হয়েছেঃ

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ —অর্থাৎ আমার বিশেষ বান্দাদের উপর তোর কোন ক্ষমতা চলবে না। এক হাদীসেও তাঁদের সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به —অর্থাৎ কোন ব্যক্তি ততক্ষণ কামেল মু'মিন হতে পারে না, যতক্ষণ তার খেয়াল-খুশী আমার শিক্ষার অনুসারী না হয়ে যায়।

কাফিররা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কিয়ামতের নির্দিষ্ট দিন-তারিখ ও সময় বলে দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করত। সূরার উপসংহারে তাদের এই হঠকারিতার জওয়াব দেওয়া হয়েছে। জওয়াবের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অপার রহস্য বলে এ বিষয়ের জ্ঞান নিজের জন্যই নির্দিষ্ট রেখেছেন। এই সংবাদ কোন ফেরেশতা অথবা রসূল (সা)-কে তিনি দেন নি। কাজেই এ দাবী অসার।
